Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া তাবাসসুম তিথী

রোলঃ 216020029

২৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ফজিলত ও নামাজ তরককারির বিধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া তাবাসসুম তিথী

রোলঃ 216020029

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "নামাজের গুরুত্ব ফজিলত ও নামাজ তরককারির বিধান" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাদিয়া তাবাসসুম তিথী, আইডিঃ 216020029 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নামাজের গুরুত্ব ফজিলত ও নামাজ তরককারির বিধান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সাদিয়া তাবাসসুম তিথী

(স্বাক্ষর)

সাদিয়া তাবাসসুম তিথী

আইডিঃ 216020029

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

সূচীপত্র

ভূমিকা:

সালাত বা সালাহ (আরবি: صلاة স্বলাহ্, স্বলাত্, আরবি: الصلاة আস-সালাত, অর্থ "প্রার্থনা", "দোয়া" বা "প্রশংসা") -এর আভিধানিক অর্থ দোয়া, রহমত, ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি। আর নামাজের পারিভাষিক অথ হলো এমন কিছু কথা ও কাজ নিদিষ্ট কিছু শত সাপেক্ষে তাকবীরের মাধ্যমে শুরু করা হয় এবং ছালামের মাধ্যমে শেষ করা হয়। কোরআনে ইসলামী আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা হিসেবে সালাত শব্দটিকেই ব্যবহার করা হয়েছে।

حٰفِظُوۡا عَلَی الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوۃِ الۡوُسۡطٰی * وَ قُوۡمُوۡا لِلّٰہِ قٰنِتِیۡنَ

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন তোমরা সলাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সলাতের প্রতি এবং আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দন্ডায়মান হও। (সুরা বাকারা ২৩৮)

নামাজ হলো শ্রেষ্ঠ ইবাদত। কেননা তা আল্লাহর সাথে বান্দার সংযোগ স্থাপন করে নামাজ হলো আল্লাহ তায়ালার অগণিত নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

তাওহীদের আলোচনায় দেখেছি যে, সালাত বা নামায হলো ইসলামের দ্বিতীয় রুকুন। সালাত এমন একটি ফরয ইবাদত যার কোনো বিকল্প নেই। ইসলামে সকল বিধান সহজ করে দেওয়া হয়েছে। একজন অসুস্থ মানুষ রোযা কাযা করতে পারেন এবং পরে রাখতে পারেন। একেবারে অক্ষম মানুষ ফিদইয়া- কাফ্ফারা দিতে পারেন। কিন্তু সালাতের ক্ষেত্রে সেই বিধান নেই। সালাতকে অন্যভাবে সহজ করা হয়েছে। তা হলো মুমিন যেভাবে পারেন তা আদায় করবেন। সম্ভব হলে পূর্ণ নিয়মানুসারে।

না হলে দাঁড়িয়ে,

বসে, শুয়ে, দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে, যানবাহনে আরোহণ রত অবস্থায়, পোশাক পরিধান করে, উলঙ্গ হয়ে... যে ভাবে সম্ভব মুমিন তাঁর প্রভুর দরবারে হাযিরা দেবেন। কোনো সূরা, কিরাআত বা দোয়া না জানা থাকলে শুধুমাত্র আল্লাহু আকবার বলে বলে বা তাসবীহ-তাহলীল-এর মাধ্যমে সালাত আদায় করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই সময় মত হাযিরা

দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের যতক্ষণ হুশ রয়েছে, ততক্ষণ তার দায়িত্ব হলো সময় মত সালাত আদায় করা। আল্লাহ বলেন:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

"তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের, এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে। যদি তোমরা আশংকিত থাক তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায়, আর যখন নিরাপদ বোধ করবে তখন আল্লাহর যিক্র কর (অর্থাৎ সালাত আদায় কর) যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।"

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

"সেই ব্যক্তিই সাফল্য অর্জন করতে পারে, যে নিজেকে পবিত্র করে এবং নিজ প্রভুর নাম স্মরণ করে সালাত আদায় করে।"

নামায মুমিনের চক্ষুকে শীতল করে, তার যাবতীয় ছোট ছোট গুনাহ বা লঘু ও উপপাপকে মোচন করে দেয়। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "কি অভিমত তোমাদের, যদি তোমাদের কারো দরজার সামনেই একটি নদী থাকে এবং সেই নদীতে সে প্রত্যহ্ পাঁচবার গোসল করে, তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে কি? সকলে বলল, 'না, তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না।' তিনি বললেন, "অনুরুপই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপমা। ঐ নামাযসমূহের ফলেই (নামাযীর) সমস্ত গুনাহকে আল্লাহ মোচন করে দেন।" (বুখারী ৫২৮নং, মুসলিম ৬৬৭নং, তিরমিযী, নাসাঈ)

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "কাবীরাহ্ গুনাহ না করলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমুআহ থেকে অপর জুমুআহ -এর মধ্যবর্তীকালে সংঘটিত পাপসমূহের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত)।" (মুসলিম ২৩৩নং, তিরমিযী, প্রমুখ)

একদা আমিও আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর সাথে গাছের নিচে ছিলাম। তিনি আমার সামনে অনুরুপ করলেন; গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হিলিয়ে দিলেন। এতে তার সমস্ত পাতা খসে পড়ল। অতঃপর বললেন, "হে সালমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না কি যে, কেন আমি এরুপ করলাম?" আমি বললাম, কেন করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, "মুসলিম যখন সুন্দরভাবে ওযু করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে তখন তার পাপরাশি ঠিক ঐভাবেই ঝরে যায় যেভাবে এই পাতাগুলো ঝরে গেল। আর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন,

وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّآتِ، ذَلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِيْنَ

অর্থাৎ, আর তুমি দিনের দু' প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে নামায কায়েম কর। পুণ্যরাশি অবশ্যই পাপরাশিকে দূরীভূত করে দেয়। (আল্লাহর) স্মরণকারীদের জন্য এ হল এক স্মরণ। (সূরা হূদ ১১৪ আয়াত) (আহ্মদ, নাসাঈ, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৩৫৬নং)

মহানবী (ﷺ) বলেন, "বান্দা যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন তার সে তার সমস্ত গুনাহকে নিয়ে তার মাথায় ও দুই কাঁধে রাখা হয়। অতঃপর সে যখনই রুকূ ও সিজদা করে, তখনই একটি একটি করে সমস্ত গুনাহগুলি ঝরে পড়ে যায়।" (বাইহাকী, সহীহ জামে ১৬৭১নং)

সালাত হলো,

মানুষের পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার একমাত্র পথ। সালাতই মানুষকে পরিশীলিত করে এবং মানবতার পূর্ণতার শিখরে তুলে দেয়। সালাতের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে মানসিক দৃঢ়তা ও ভারসাম্য অর্জন করেন এবং মানবীয় দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন। কুরআন কারীমে এরশাদ করা হয়েছে:

إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ

"নিশ্চয় মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই অস্থিরচিত্ত ও ধৈর্যহারা। বিপদে পড়লে সে অধৈর্য ও হতাশ হয়ে পড়ে। আর কল্যাণ বা সম্পদ লাভ করলে সে কৃপণ হয়ে পড়ে। একমাত্র ব্যতিক্রম সালাত আদায়কারীগণ (তারা এ মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন।) যারা সর্বদা (নিয়মিতভাবে) সালাত আদায় করেন।"

সালাত গোনাহ মার্জনার অন্যতম উপায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا

"যদি তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় একটি নদী থাকে, যেখানে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে তার দেহে কি ধুলি ময়লা কিছু অবশিষ্ট থাকবে? সাহাবীগণ বলেন: না। তার ধুলিময়লা কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি বলেন: পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও অনুরূপ। এগুলির মাধ্যমে আল্লাহ পাপরাশি ক্ষমা করেন।"

সালাতকে আমরা দায়িত্ব মনে করি।

আসলে সালাত দায়িত্ব নয়, সুযোগ। আল্লাহ আমাদের সুযোগ দিয়েছেন, দিনের মধ্যে পাঁচবার তাঁর সাথে কথা বলে, মনের সকল আবেগ তাঁকে জানিয়ে, তাঁর রহমত, বরকত লাভ করে আমরা ধন্য হব। সালাতই সকল সফলতার চাবিকাঠি।

আল্লাহ বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ

"মুমিনগণ সফলকাম হয়েছেন, যারা অত্যন্ত বিনয় ও মনোযোগিতার সাথে সালাত আদায় করেন।"

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

"সেই ব্যক্তিই সাফল্য অর্জন করতে পারে, যে নিজেকে পবিত্র করে এবং নিজ প্রভুর নাম স্মরণ করে সালাত আদায় করে।"

সালাত হলো,

মানুষের পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার একমাত্র পথ। সালাতই মানুষকে পরিশীলিত করে এবং মানবতার পূর্ণতার শিখরে তুলে দেয়। সালাতের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর

কাছে প্রার্থনা করে মানসিক দৃঢ়তা ও ভারসাম্য অর্জন করেন এবং মানবীয় দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন। কুরআন কারীমে এরশাদ করা হয়েছে:

إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ

"নিশ্চয় মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই অস্থিরচিত্ত ও ধৈর্যহারা। বিপদে পড়লে সে অধৈর্য ও হতাশ হয়ে পড়ে। আর কল্যাণ বা সম্পদ লাভ করলে সে কৃপণ হয়ে পড়ে। একমাত্র ব্যতিক্রম সালাত আদায়কারীগণ (তারা এ মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে উঠতে পারেন।) যারা সর্বদা (নিয়মিতভাবে) সালাত আদায় করেন।

নামায বা সালাত হলো

মুমিন ও কাফিরের মধ্যে মাপকাঠি। সালাত ত্যাগ করলে মানুষ কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاة

"একজন মানুষ ও কুফরী-শিরকের মধ্যে রয়েছে নামায ত্যাগ করা।"

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ فَقَدْ كَفَر

"যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল সে কাফির হয়ে গেল।"

কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আলোকে একথা নিশ্চিত যে, নামায মুসলিমের মূল পরিচয়। নামায ছাড়া মুসলিমের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। নামায পরিত্যাগকারী কখনোই মুসলিম বলে গণ্য হতে পারেন না।

সালাত কাযা করাকে “কুফরী” গোনাহ বলে উল্লে-খ করা হয়েছে হাদীসে। এজন্য এক ওয়াক্ত সালাত ত্যাগ করা দিনরাত শূকরের গোশত ভক্ষণ করা, মদপান করা, রক্তপান করা ইত্যাদি সকল ভয়ঙ্কর গোনাহের চেয়েও বেশী গোনাহ। যে ব্যক্তি মনে করেন যে, নামায না পড়লেও ভাল মুসলমান থাকা যায় সে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে কাফির; কারণ তিনি নামাযের ফরযিয়্যত মানেন না।

আর যিনি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেন যে, নামায কাযা করলে কঠিনতম গোনাহ হয়, এরপরও ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো নামায পরিত্যাগ করেন তাকে মুসলমান বলে গণ্য করা যাবে কিনা সে বিষয়ে ফকীহদের মতভেদ আছে। সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগে এই প্রকারের মানুষকেও কাফির বা অমুসলিম বলে গণ্য করা হত। সহীহ হাদীসে তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু শাকীক বলেন

ِكَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَة
“মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-সাহাবীগণ সালাত ছাড়া অন্য কোনো কর্ম ত্যাগ করাকে কুফ্রী মনে করতেন না।”

ইমাম আহমদ এ মত পোষণ করেন। এ মতে মুসলিম কোন পাপকে পাপ জেনে পাপে লিপ্ত হলে কাফির বলে গণ্য হবে না। একমাত্র ব্যতিক্রম নামায ত্যাগ করা। যদি কেউ নামায ত্যাগ করাকে কঠিনতম পাপ জেনেও এক ওয়াক্ত ফরয নামায ইচ্ছা পূর্বক ত্যাগ করে তবে সে মুরতাদ বলে গণ্য হবেন। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিয়ী প্রমুখ ইমাম বলেন যে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সরাসরি কাফির বলা যাবে না, তবে তাকে নামায ত্যাগের শাস্তি স্বরূপ জেল ও মৃত্যুদ- প্রদান করতে হবে।

ফরয সালাত কাযা করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
(ِلاَ تَتْرُكْ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّداً فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ (ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِه

“ইচ্ছাপূর্বক এক ওয়াক্ত ফরয সালাতও পরিত্যাগ করবে না। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক এক ওয়াক্ত ফরয সালাত পরিত্যাগ করবে, সে আল্লাহর যিম্মা ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিম্মা থেকে বহিস্কৃত হবে।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ.

“কেয়ামতের দিন বান্দাকে সর্বপ্রথম তার সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সালাত টিকলে তার অন্য সকল আমল টিকে যাবে। আর সালাতই যদি নষ্ট হয় তবে সে নিরাশ ও ধ্বংসগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরয থেকে কিছু কম পড়ে তবে আল্লাহ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোনো নফল আছে কিনা, তখন তার নফল সালাত দিয়ে ফরযে ক্রুটিবিচ্যুতি পূরণ করা হবে। অতপর তার সকল আমল এরূপ হবে।”

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত পরিত্যাগ কর তাহলে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। যখনই কোনো ব্যক্তি সুন্দর রূপে ওযু বা গোসল করে পবিত্র হয় এবং এরপর সে এ সকল মসজিদের যে কোনো একটি মসজিদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে তখন আল্লাহ তার ফেলা প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে তার জন্য একটি পুণ্য লিখেন, তাকে একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার একটি পাপ ক্ষমা করে দেন। আমরা আমাদেরকে দেখেছি যে, শুধুমাত্র যে মুনাফিকের মুনাফিকী সুপরিচিত সে ছাড়া কেউই জামা‘আত থেকে পিছে পড়ত না। অনেক মানুষকে দুই ব্যক্তির কাঁধের উপর ভর করে টেনে এনে সালাতের কাতারে দাঁড় করানো হতো।১১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ (فَلَمْ يُجِبْ) فَلا صَلاةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ

"যে ব্যক্তি নামাযের আহ্বান (আযান) শুনতে পেল কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিয়ে জামাতে এলো না, তার নামাযই হবে না। তবে যদি ওযর (ভয় বা অসুস্থতা) থাকে তাহলে হতে পারে।"

সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

১। সালাত হিফাযত বা সংরক্ষণকারীর জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন, যে তা হিফাযত করল তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন...।" (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

২। যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করল তার জন্য সালাত জ্যোতি ও প্রমাণ হবে: অর্থাৎ সালাত তার ঈমানের দলীল হবে এবং কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের কারণ হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে সালাতের হিফাযত করল সালাত তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও কিয়ামতের দিন মুক্তির কারণ হবে।"

৩। সালাত বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱسۡجُدۡ وَٱقۡتَرِب﴾ [العلق: ١٩]

"আর সাজদাহ কর ও (আমার) নিকটবর্তী হও।" [সূরা আল-'আলাক, আয়াত: ১৯]

অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং সমস্ত সৎ কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ কর, আর সৎ কাজের মধ্যে আল্লাহর জন্য সাজদাহ হচ্ছে সবচেয়ে বড়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "বান্দা স্বীয় রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সাজদাহ অবস্থায়। অতএব, তোমরা সাজদায় বেশি-বেশি দো'আ কর।" (সহীহ মুসলিম ও নাসাঈ)

দেখুন সালাতই হচ্ছে আপনার ও আল্লাহর মাঝে সম্পর্ক গড়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। অতএব, আপনি যদি চান তবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে (সালাতের মাধ্যমে) বেশি-বেশি সাজদাহ ও রুকুর মাধ্যমে এ সম্পর্ক বৃদ্ধি করুন। এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে বেশি-বেশি দো'আ করার ওসীয়ত করেছেন।

৪। সালাত গুনাহ ও মন্দ কাজের কাফফারা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত পেল আর সালাতের জন্য উত্তমরূপে অযু করল যথাযথ খুশু-খুযু নিয়ে সালাত আদায় করল, ঠিকমত রুকু করল। এ সালাত তার বিগত গুনাহের কাফফারা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হবে। আর এই ফযীলত সব সময়ের জন্য।" (সহীহ মুসলিম)

প্রিয় পাঠক! উক্ত হাদীসের শেষ অংশের দিকে লক্ষ্য করুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন: "যতক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হবে" কেননা কবীরা গুনাহ খাঁটি ও আন্তরিক তাওবা ব্যতীত মাফ হবে না।

৫। সালাত সর্বোত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত: আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন: সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন, "সময়মত সালাত আদায় করা"। আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ বলেন, তারপর কোনটি? তিনি বলেন, "পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা"। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ

বলেন, আমি বললাম: তারপর কী? তিনি বললেন: “আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।” (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

৬। সালাতের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন আত্মিক প্রশান্তি-আরাম এবং চক্ষু শীতলতা: আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]

“জেনে রাখ! আল্লাহর যিকিরেই আত্মা প্রশান্ত হয়।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ২৮]

আর সম্পূর্ণ সালাতই আল্লাহর যিকির বরং সালাত আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ﴾ [طه: ١٤]

“আমার যিকিরের (স্মরণের) জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৪]

এ জন্যই মুসলিমগণ সালাতের মধ্যে অর্জন করে সুখ-শান্তি ও আরাম। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, “উঠো বিলাল এবং আমাদেরকে সালাতের মাধ্যমে আরাম পৌঁছাও।” (মুসনাদে আহমদ) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার চক্ষু প্রশান্তি সালাতের মধ্যে নিহিত রয়েছে।” (সুনান নাসাঈ)

পক্ষান্তরে সালাত পরিত্যাগকারী হলো আল্লাহর যিকির (সালাত) বিমুখ, আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর যিকির থেকে বিমুখদের জন্য তার জীবন-যাপন সংকুচিত করার ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ ١٢٤﴾ [طه: ١٢٤]

"যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্য তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।" [সুরা ত্বাহা, আয়াত: ১২]

৬.৬। সালাতের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন আত্মিক প্রশান্তি-আরাম এবং চক্ষু শীতলতা: আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]

"জেনে রাখ! আল্লাহর যিকিরেই আত্মা প্রশান্ত হয়।" [সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ২৮]

আর সম্পূর্ণ সালাতই আল্লাহর যিকির বরং সালাত আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ﴾ [طه: ١٤]

"আমার যিকিরের (স্মরণের) জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর।" [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৪]

এ জন্যই মুসলিমগণ সালাতের মধ্যে অর্জন করে সুখ-শান্তি ও আরাম। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, "উঠো বিলাল এবং আমাদেরকে সালাতের মাধ্যমে আরাম পৌঁছাও।" (মুসনাদে আহমদ) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার চক্ষু প্রশান্তি সালাতের মধ্যে নিহিত রয়েছে।" (সুনান নাসাঈ)

পক্ষান্তরে সালাত পরিত্যাগকারী হলো আল্লাহর যিকির (সালাত) বিমুখ, আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর যিকির থেকে বিমুখদের জন্য তার জীবন-যাপন সংকুচিত করার ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ ١٢٤﴾ [طه: ١٢٤]

“যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্য তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।” [সুরা ত্বাহা, আয়াত: ১২৪]

এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আমরা সাধারণত সালাতে অলসতাকারীদেরকে দেখতে পাবো যে, তারা আত্মিক অস্থিরতা, স্নায়ুর চাপ ও নানা ধরণের মানসিক যন্ত্রনায় ভুগে।

৭। সালাত মুসলিমের ইহকাল ও পরকালের কাজ কর্মে সহায়ক: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ﴾ [البقرة: ٤٥]

“তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৫]
এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পতিত হতেন তখনই ভয় ও ভীতির সঙ্গে দ্রুত সালাত পড়তে যেতেন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সম্মুখীন হতেন তখন সালাত আদায় করতেন।” (মুসনাদে আহমদ) সাবেত রহ. বলেন, “নবীগণ যখন কোনো বড় কাজের সম্মুখীন হতেন সালাতের দিকে অগ্রসর হতেন।” (তাফসীর ইবন কাসীর)

কারণ, সালাতই হলো বান্দা এবং তার রবের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যম, যেমন ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব মুসলিম যখন কোনো কাজের মনস্থ করবে সে মহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণাপন্ন হবে যাঁর হাতে রয়েছে সব কিছুর ক্ষমতা, যিনি কোনো ব্যাপারে বলেন

হয়ে যাও, আর তা হয়ে যায়, যিনি আর্ত অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ﴾ [النمل: ٦٢]

"নাকি তিনি যিনি অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন?" [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২]

সালাতে অবহেলাকারী যখন কোনো বড় সমস্যায় পতিত হয় এবং বিপদে আচ্ছন্ন হয় তখন সে কার স্মরণাপন্ন হবে? সে তো আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বা সে তো শুধু কঠিন ও বিপদের সময় সালাত আদায় করে। অতএব, এ সালাত তার না কোনো উপকারে আসবে, না আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে তুলবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তুমি আল্লাহকে সুখে-সাচ্ছন্দে চেন, আল্লাহ তোমাকে বিপদে-আপদে চিনবে।" (মুসনাদ আহমদ)

অবশ্য কেউ যদি কঠিন বিপদে-আপদে আল্লাহর নিকট তাওবা করে এবং সালাতের হিফাযতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, তবে আল্লাহ তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন।

৮।সালাতে রয়েছে ইহকাল ও পরকালের সফলতা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢﴾ [المؤمنون: ١، ٢]

"অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র।" [সূরা আল-মুমিন, আয়াত: ১-২]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ١٥﴾ [الاعلا: ١٤، ١٥]

“নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে, এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।” [সূরা আল-আ‘লা, আয়াত: ১৪-১৫]

আয়াতে উল্লিখিত “ফালাহ” শব্দটি এমন ব্যাপক যার অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ বুঝায়।

৯। সালাতের মধ্যে রয়েছে রুযীর প্রশস্ততা: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَاۖ لَا نَسۡـَٔلُكَ رِزۡقٗاۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكَۗ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلتَّقۡوَىٰ ١٣٢﴾ [طه: ١٣٢]

“এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও আর তাতে অবিচল থাক, আমরা তোমার নিকট কোনো রুযী চাই না, আমরাই তোমাকে রুযী দেই এবং শুভ পরিণাম তো তাকওয়াধারীদের জন্য।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৩২]

ইবন কাসীর রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, “অর্থাৎ যদি সালাত প্রতিষ্ঠা কর এমনভাবে তোমার নিকট রুযী আসবে যার তুমি ধারণাও করতে পারবে না।”

১০। সালাত আত্মার যাকাত, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা: সালাত অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচার এক দুর্ভেদ্য দূর্গ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱتۡلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥]

“তুমি পাঠ কর কিতাব থেকে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা কর, সালাত অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।” [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৪৫]

অর্থাৎ সালাত সংরক্ষণকারী এবং গুরুত্ব দানকারী নিজের মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অনুভব করবে এবং সে অতিসত্বর অশ্লীল ও মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকবে। এ জন্য পিতা-মাতার জরুরি কর্তব্য হলো, তারা যেন সন্তানদেরকে বাল্যাবস্থাতেই সালাতের প্রতি আগ্রহের পূর্ণ প্রশিক্ষণ দেয়, তারা যেন মন্দ-অশ্লীলতা ও খারাপ নেশায় আসক্ত না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানের পিতা-মাতাকে এরই ওসীয়ত করেন এবং বলেন, “যখন তোমাদের সন্তান সাত বছরের হয় তখন তাদেরকে সালাতের আদেশ কর এবং যখন তারা দশ বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে সালাতের জন্য (ত্যাগ করলে) প্রহার কর এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও”। (সুনান আবু দাউদ)

১১। সালাত ইহকাল ও পরকালে মুমিনদের জন্য দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনে: অতএব, সালাত আদায়কারীর যখন সুখ আসে তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তা তার জন্য উত্তম এবং যখন কোনো বিপদ দেখা দেয় তখন ধৈর্য ধারণ করে, সেটাও তার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু বেনামাযীর অবস্থা এর বিপরীত। উক্ত অবস্থায় সে হা-হুতাশ ও অতি কৃপণতা শুরু করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ١٩ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعٗا ٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلۡخَيۡرُ مَنُوعًا ٢١ إِلَّا ٱلۡمُصَلِّينَ ٢٢ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ دَآئِمُونَ ٢٣﴾ [المعارج[١٩، ٢٣ :

“মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্ত রূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে অতি কৃপণ হয়। তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত। যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত।” [সূরা আল-মা‘আরিজ, আয়াত: ১৯-২৩]

১২। সালাত বান্দার জন্য ইহকাল ও পরকালে হিফাযত ও নিরাপত্তামূলক: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

»مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي عَهْدِهِ، فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللَّهُ حَتَّى يَكُبَّهُ فِي النَّارِ، عَلَى وَجْهِه«ِ

যে ব্যক্তি সকালের (ফজরের) সালাত আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়), কেউ যেন আল্লাহর এ জিম্মাদারী নষ্ট না করে। যে কেউ তাকে হত্যা করবে, আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন এবং তাকে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে অধোমুখে নিক্ষেপ করবেন।" (সহীহ মুসলিম)

১৩। সালাত আদায়ের ফলে আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা অর্জন হয়: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة[١٠٨ :

"আল্লাহ বেশি বেশি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৮]

আর সালাত আদায়কারী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা পবিত্রতা অর্জন করা সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত।

প্রত্যেক সালাত আদায়কারী কি উপরোক্ত ফযীলত ও উপকারিতা অর্জন করবে:

আল্লাহ তা'আলার বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন:

﴿فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٤ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٥﴾ [الماعون[٤، ٥ :

“সুতরাং দুর্ভোগ (‘ওয়াইল’ জাহান্নামের একটি স্থান) সেই সালাত আদায়কারীদের যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন।” [সূরা আল-মাউন, আয়াত: ৪-৫]

তাফসীরকারকগণ এই আয়াতের তাফসীর করেন যে, এই আয়াত দ্বারা ঐ সমস্ত লোক বুঝায়, যারা সালাতকে তার সময় থেকে পিছিয়ে অসময়ে আদায় করে। সা‘দ ইবন আবী ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন “এরা ঐ সমস্ত মানুষ যারা সালাতকে তার (প্রকৃত) সময়ে আদায় না করে পরে আদায় করে”। (তাফসীর ইবন কাসীর)

আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে মুসল্লী (সালাত আদায়কারী) নামে অভিহিত করা সত্ত্বেও তাদেরকে ওয়াইলের হুশিয়ারী দিয়েছেন। কেননা তারা সালাত প্রকৃত সময়ের পরে আদায় করে। অতএব, সালাতকে আপন ওয়াক্ত থেকে পরে আদায় করার জন্য আল্লাহ যাদেরকে ওয়াইলের হুশিয়ারী দিয়েছেন, তারা কীভাবে উপরোক্ত উপকারিতা ও ফযীলতের অধিকারী হবে?

সুতরাং সালাতের জন্য রয়েছে নির্ধারিত ওয়াক্ত। শর‘ঈ ওযর ব্যতীত নির্ধারিত ওয়াক্ত নষ্ট করা যাবে না। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ [النساء: ١٠٣]

“নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩]

ইবন কাসীর রহ. তার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন: “ইবন আব্বাস “মাওকূতান” এর তাফসীরে ফরয অর্থ নিয়েছেন”। তিনি আরো উল্লেখ করেন: “হজের মতো সালাতেরও সময় নির্ধারিত”। অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন: “ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হজের মতো সালাতেরও একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে”।

প্রিয় পাঠক! (আপনার প্রতি আল্লাহ রহম করুন) সাহাবীগণের যুগের তাফসীরের ইমামদের প্রতি লক্ষ্য করুন। ইবন মাসউদ ও ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কীভাবে হজের মতো সালাতেরও এক নির্ধারিত সময় সাব্যস্ত করেছেন। আর কে আছে এমন যে হজ নির্ধারিত সময়ে আদায় না করে তা অসময়ে আদায় করবে? সালাতেরও সময় এমনি নির্ধারিত, কোনো শর‘ঈ ওযর ব্যতীত নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় না করলে আল্লাহ কবুল করবেন না।

সম্মানিত পাঠক! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন: “যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করল, সালাত তার জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি, দলীল-প্রমাণ ও নাযাতের উসীলা হবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করল না, তার জন্য সালাত কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাযাতের উসীলা হবে না, বরং কারূন, ফিরআউন, হামান এবং উবাই ইবন খালাফের সাথে তার হাশর (পুনরুত্থান) হবে”। (মুসনাদে আহমদ)

আর যে ব্যক্তি সালাত ঠিক সময়ে আদায় করল না, সে সালাতের হিফাযতও করল না।

অতএব, সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায়ে তৎপর হোন ও এর প্রতি গুরুত্ব দিন। সালাতের নিয়ম-কানূন শিখার প্রতিও তেমনি তৎপর হউন, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«صلوا كما رأيتموني أصلى»

“তোমরা সেভাবে সালাত পড় যেভাবে আমাকে সালাত পড়তে দেখ।” (সহীহ বুখারী)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি প্রবেশ করল ও সালাত আদায় করল তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সালাম দিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফিরে যাও পুনরায় সালাত আদায় কর, কেননা তুমি সালাতই আদায় কর নি। সে তিনবার একইভাবে আদায় করল।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই লোকটির ওপর বিধান আরোপ করলেন যে, সে সালাতই আদায় করে নি শুধু তার সালাতে স্থিরতা না থাকার কারণে। আর এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শিক্ষা দিয়ে দিলেন সালাত কীভাবে আদায় করতে হয়।

অতএব, আমরা পরিশেষে উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ ফলাফলে পৌঁছতে পারি যে, সালাত অবশ্যই যথাসময়ে আদায় করতে হবে এবং তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতেরই অনুরূপ হতে হবে। তবেই ইনশাআল্লাহ উক্ত সালাত গ্রহণযোগ্য ও উপকারী হবে এবং দুনিয়াতেও

ফল প্রকাশিত হবে।

নামাযের শর্তাবলী

১। নামাযীকে প্রকৃত মুসলিম হতে হবে

২। জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। (পাগল বা জ্ঞানশূন্য হবে না)

৩। বিবেকসম্পন্ন হতে হবে। (সাত বছরের নিম্ন বয়সী শিশু হবে না)

৪। (ওযু-গোসল করে) পবিত্র হতে হবে

৫। নামাযের সঠিক সময় হতে হবে

৬। শরীরের লজ্জাস্থান আবৃত হতে হবে

৭। শরীর, পোশাক ও নামাযের স্থান থেকে নাপাকী দূর করতে হবে

৮। কিবলার দিকে মুখ করতে হবে

৯। মনে মনে নিয়ত করতে

নামাযের আরকানসমূহ

১। (ফরয নামাযে) সামথ্য হলে কিয়াম (দাঁড়ানোর সময় দাঁড়িয়ে নামায পড়া)

২। তাকবীরে তাহ্‌রীমা

৩। (প্রত্যেক রাকআতে) সূরা ফাতিহা

৪। রুকু

৫। রুকু থেকে উঠে খাড়া হওয়া

৬। (সাষ্টাঙ্গে) সিজদাহ

৭। সিজদাহ থেকে উঠে বসা

৮। দুই সিজদার মাঝে বৈঠক

৯। শেষ তাশাহহুদ

১০। তাশাহহুদের শেষ বৈঠক

১১। উক্ত তাশাহ্‌হুদে নবী (ﷺ) এর উপর দরুদ পাঠ

১২। দুই সালাম

১৩। সমস্ত রুকনে ধীরতা ও স্থিরতা

১৪। আরকানের মাঝে তরতীব ও পর্যায়ক্রম

নামাযের ওয়াজেবসমূহ

১। তাকবীরে তাহ্‌রীমা ছাড়া সমস্ত তাকবীর

২। রুকুর তাসবীহ্‌

৩। (ইমাম ও একাকী নামাযীর জন্য) 'সামিআল্লাহু লিমানহামিদাহ্‌' বলা

৪। (সকলের জন্য) 'রাব্বানা অলাকালহাম্‌দ' বলা

৫। সিজদার তাসবীহ্‌

৬। দুই সিজদার মাঝে দুআ

৭। প্রথম তাশাহহুদ

৮। তাশাহহুদের প্রথম বৈঠক

নামায কখন ফরয হয়?

হিজরতের পূর্বে নবুওয়াতের ১২ অথবা ১৩তম বছরে শবে-মি'রাজে সপ্ত আসমানের উপরে সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রসূলের সাক্ষাতে (বিনা মাধ্যমে) নামায ফরয হয়। প্রত্যহ্‌ ৫০ ওয়াক্তের নামায ফরয হলে হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত জিবরীল (আঃ) এর পরামর্শমতে মহানবী (ﷺ) আল্লাহ তাআলার নিকট কয়েকবার যাতায়াত করে নামায হাল্কা করার দরখাস্ত পেশ করলে ৫০ থেকে ৫ অক্তে কমিয়ে আনা হয়। কিন্তু আল্লাহর কথা অনড় বলেই ঐ ৫ ওয়াক্তের বিনিময়ে ৫০ ওয়াক্তেরই সওয়াব নামাযীরা লাভ করে থাকেন। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৮৬৪নং)*

নামায ফরয হওয়ার গোড়াতে (৪ রাকআতবিশিষ্ট নামাযগুলো) দু' দু' রাকআত করেই ফরয ছিল। পরে যখন নবী (ﷺ) মদ্বীনায় হিজরত করলেন, তখন (যোহ্‌র, আসর ও এশার

নামাযে) ২ রাকআত করে বেড়ে ৪ রাকআত হল। আর সফরের নামায হল ঐ প্রথম ফরমানের মুতাবেক। *(বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, মুসনাদ, মিশকাত ১৩৪৮ নং)*

জামাতে নামায ত্যাগ করা

যেমন ভয়ঙ্কর অপরাধ ও গোনাহের কাজ, তেমনি জামাতে নামায আদায় অপরিমেয় সাওয়াব ও বরকতের কাজ। ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

একাকী সালাতের চেয়ে জামা'আতে সালাতের মর্যাদা ২৭ গুণ বেশি।

রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করবে সে আল্লাহর যিম্মায় থাকবে। ইশার সালাত জামাতে আদায় করলে অর্ধেক রাত তাহাজ্জুদের সাওয়াব হবে। আর ফজরের সালাত জামাতে আদায় করলে পুরো রাত তাহাজ্জুদের সাওয়াব হবে।

এক হাদীসে রাসূলুল্ল-াহ ৎ বলেন:

مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য চল্লিশ দিন প্রথম তাকবীরসহ পরিপূর্ণ নামায জামাতে আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহ দুইটি মুক্তি লিখে দিবেন: জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও মুনাফিকী থেকে মুক্তি।"

ফরয সালাত যেমনশ্রেষ্ঠতম ইবাদত,

তেমনি নফল সালাতও সর্বশ্রেষ্ঠ নফল ইবাদত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম উপায়। আমরা অনেক সময় 'নফল' নামাযে অবহেলা করি। নফলের গুরুত্বও প্রদান করতে চাই না। ফরয বাদ দিয়ে শুধু নফল ইবাদত করা বকধার্মিকতা। আবার নফল বাদ দিয়ে শুধু ফরয ইবাদত পালন করাও দীন সম্পর্কে বড় অবহেলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনে আমরা দেখতে পাই সকল প্রকার নফল ইবাদতের প্রতি সীমাহীন গুরুত্ব ও আগ্রহ।

নফল নামাজের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত হলো নির্ধারিত নফল নামাজ; যথা: তাহাজ্জুদ নামাজ, ইশরাক নামাজ, চাশত নামাজ, জাওয়াল নামাজ, আউওয়াবিন নামাজ। এ ছাড়া রয়েছে আরও কিছু অনির্ধারিত নফল নামাজ। ফরজ ও ওয়াজিব নামাজ ছাড়া বাকি সব নামাজকেই নফল নামাজ বলা হয়। (কিতাবুস সালাত)।

যে নামায পড়া বাধ্যতামূলক নয়, যা ত্যাগ করলে গুনাহ হয় না কিন্তু পড়লে সওয়াব হয় সেই শ্রেণীর নামাযের বড় মাহাত্ম রয়েছে শরীয়তে।

রসূল (ﷺ) বলেন, "কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট থেকে তার আমলসমূহের মধ্যে যে আমলের হিসাব সর্বাগ্রে নেওয়া হবে, তা হল নামায। নামায ঠিক হলে সে পরিত্রাণ ও সফলতা লাভ করবে। নচেৎ (নামায ঠিক না হলে) ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং (হিসাবের সময়) ফরয নামাযে কোন কমতি দেখা গেলে আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা ফিরিশ্‌তাদের উদ্দেশ্যে বলবেন, 'দেখ, আমার বান্দার কোন নফল (নামায) আছে কি না।' অতএব তার নফল নামায দ্বারা ফরয নামাযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর আরো সকল আমলের হিসাব অনুরুপ গ্রহণ করা হবে।" (আবূদাঊদ, সুনান ৭৭০, তিরমিযী, সুনান ৩৩৭, সইবনে মাজাহ্‌, সুনান ১১৭নং, সহিহ তারগিব ১/১৮৫)

মহানবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার ওলীর বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। বান্দা যা কিছু দিয়ে আমার নৈকট্য লাভ করে থাকে তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম হল সেই ইবাদত, যা আমি তার উপর ফরয করেছি।

আর সে নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। পরিশেষে আমি তাকে ভালোবাসি। অতঃপর আমি তার শোনার কান হয়ে যাই, তার দেখার চোখ হয়ে যাই, তার ধরার হাত হয়ে যাই, তার চলার পা হয়ে যাই! সে আমার কাছে কিছু চাইলে আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি। সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। আর আমি যে কাজ করি তাতে কোন দ্বিধা করি না -যতটা দ্বিধা করি এজন মুমিনের জীবন সম্পর্কে; কারণ, সে মরণকে অপছন্দ করে। আর আমি তার (বেঁচে থেকে) কষ্ট পাওয়াকে অপছন্দ করি।” (বুখারী ৬৫০২নং)

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ বান্দার কান, চোখ, হাত ও পা হওয়ার অর্থ হল, বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি মতেই এ সবকে ব্যবহার করে। যাতে ব্যবহার করলে তিনি অসন্তুষ্ট, তাতে সে ঐ সকল অঙ্গকে ব্যবহার করে না।

ফরয নামায বিধিবদ্ধ হয়েছে দ্বীনের প্রচার ও তার প্রতীকের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে। তাই ফরয নামায প্রকাশ্যভাবে লোক মাঝে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পক্ষান্তরে নফল নামায বিধিবদ্ধ হয়েছে নিছক মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাঁর নৈকট্য লাভ করার লক্ষ্যে। সুতরাং নফল নামায যত গুপ্ত হবে, তত লোকচক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ তথা ‘রিয়া’ থেকে অধিক দূর ও পবিত্র হবে। (ফাইযুল ক্বাদীর ৪/২২০) আর সে জন্যই নফল নামায স্বগৃহে গোপনে পড়া উত্তম।

তাছাড়া নফল নামায ঘরে পড়লে নামাযের তরীকা ও গুরুত্ব পরিবার-পরিজনের কাছে প্রকাশ পায়। আর এ জন্য হুকুম হল, “তোমরা ঘরে নামায পড় এবং তা কবর বানিয়ে নিও না।” (বুখারী ৪৩২, মুসলিম, সহীহ ৭৭৭, আবূদাঊদ, সুনান ১৪৪৮, তিরমিযী, সুনান, নাসাঈ, সুনান, জামে ৩৭৮৪নং) অর্থাৎ, কবরে বা কবরস্থানে যেমন নামায নেই বা হয় না সেইরূপ নিজের ঘরকেও নামাযহীন করে রেখো না।

মহানবী (ﷺ) আরো বলেন, “তোমরা স্বগৃহে নামায পড় এবং তাতে নফল পড়তে ছেড়ো না।” (সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ১৯১০, জামে ৩৭৮৬নং)

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, “তোমাদের কেউযখন মসজিদে (ফরয) নামায সম্পন্ন করে তখন তার উচিৎ, সে যেন তার নামাযের কিছু অংশ (সুন্নত নামায) নিজের বাড়ির জন্য রাখে। কারণ বাড়িতে পড়া ঐ কিছু নামাযের মধ্যে আল্লাহ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।” (মুসলিম, সহীহ ৭৭৮নং)

মহানবী (ﷺ) বলেন, “হে মানবসকল! তোমরা স্বগৃহে নামায আদায় কর। যেহেতু ফরয নামায ছাড়া মানুষের শ্রেষ্ঠতম নামায হল তার স্বগৃহে পড়া নামায।” (নাসাঈ, সুনান, ইবনে খুযাইমাহ্, সহীহ, সহিহ তারগিব ৪৩৭নং)

নবী মুবাশ্‌শির (ﷺ) বলেন, “যেখানে লোকে দেখতে পায় সেখানে মানুষের নফল নামায অপেক্ষা যেখানে লোকে দেখতে পায় না সেখানের নামায ২৫ টি নামাযের বরাবর।” (আবূ য়্যা’লা, জামে ৩৮২১নং)

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, “লোকচক্ষুর সম্মুখে (নফল) নামায পড়া অপেক্ষা মানুষের স্বগৃহে নামায পড়ার ফযীলত ঠিক সেইরুপ, যেরুপ নফল নামায অপেক্ষা ফরয নামাযের ফযীলত বহুগুণে অধিক।” (বায়হাকী, সহিহ তারগিব ৪৩৮নং)

এমন কি মদ্বীনাবাসীর জন্যও মসজিদে নববীতে নফল নামায পড়ার চাইতে নিজ নিজ ঘরে পড়া বেশী উত্তম। (আবূদাঊদ, সুনান, জামে ৩৮১৪নং)

নফল নামায সাধারণত: একার নামায। তাই তাতে ইচ্ছামত লম্বা ক্বিরাআত করা যায়। বরং এই নামাযে কিয়াম লম্বা করা মুস্তাহাব। মহানবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, সবচেয়ে উত্তম নামায কি? উত্তরে তিনি বললেন, “লম্বা কিয়াম বিশিষ্ট নামায।” (আবূদাঊদ, সুনান ১৪৪৯নং)

আর এ কথা বিদিত যে, মহানবী (ﷺ) তাহাজ্জুদের নামাযে এত লম্বা কিয়াম করতেন যে, তাতে তাঁর পা ফুলে যেত। সাহাবাগণ বলেছিলেন, আল্লাহ আপনার আগের-পরের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন তবুও আপনি কেন অনুরুপ নামায পড়েন? উত্তরে তিনি

বলেছিলেন, “আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হ্ব না?” (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, মুসনাদ, তিরমিযী, সুনান, নাসাঈ, সুনান ইবনে মাজাহ্, সুনান, মিশকাত ১২২০নং)

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, সক্ষম হলে ফরয নামায দাঁড়িয়ে পড়া ফরয। কিন্তু নফল নামায ক্ষমতা থাকতেও বসে পড়াও বৈধ। যদিও বসে নামায পড়ার সওয়াব দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সওয়াবের অর্ধেক। মহানবী (ﷺ) বলেন, “বসে নামায পড়ার সওয়াব অর্ধেক নামাযের বরাবর।” (বুখারী, মিশকাত ১২৪৯নং)

বরং নফল নামায চিৎ হয়ে শুয়েও পড়া যায়। তবে এ অবস্থায় বসে পড়ার অর্ধেক সওয়াব হবে। মহানবী (ﷺ) বলেন, “আর শুয়ে নামায পড়ার সওয়াব বসে নামায পার অর্ধেক।” (বুখারী ১১১৬নং, আলমুমতে’, শারহে ফিক্হ, ইবনে উষাইমীন ৪/১১৩-১১৪)

নফল নামাযের কিছু অংশ দাঁড়িয়ে এবং কিছু অংশ বসে পড়া যায়। বরং একই কিয়ামের কিছু অংশ দাঁড়িয়ে এবং কিছু অংশ বসে ক্বিরাআত করা যায়। তাতে কিয়ামের প্রথম অথবা শেষ অংশ বসে হলেও কোন দোষাবহ্ নয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘তিনি বসে ক্বিরাআত করতেন। অতঃপর রুকূ করার ইচ্ছা করলে উঠে দাঁড়িয়ে যেতেন।’ (মুসলিম, সহীহ ৭৩১নং)

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘রাতের নামাযে আমি নবী (ﷺ)-কে বসে ক্বিরাআত করতে দেখিনি। অতঃপর তিনি যখন বার্ধক্যে উপনীত হলেন, তখন তিনি বসে ক্বিরাআত করতেন। পরিশেষে যখন ৪০ বা ৩০ আয়াত বাকী থাকত, তখন তিনি খাড়া হয়ে তা পাঠ করতেন। অতঃপর (রুকূ) সিজদা করতেন।’ (মুসলিম, সহীহ ৭৩১নং, আহমাদ, মুসনাদ, সুনানু আরবাআহ (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্)

নফল নামাযের প্রকারভেদ

ফরয নামায ছাড়া অন্যান্য নামায দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হল সেই নামায, যা (সময় ও রাকআত সংখ্যা দ্বারা) নির্দিষ্ট নয়। এ নামায নিষিদ্ধ সময় ছাড়া যে কোন সময়ে অনির্দিষ্ট রাকআতে পড়া যায়। আর দ্বিতীয় প্রকার হল সেই নামায, যা (সময় ও রাকআত সংখ্যা দ্বারা) নির্দিষ্ট। যে নামাযের নির্দিষ্ট সময় ও রাকআত সংখ্যা মহানবী (ﷺ) কর্তৃক প্রমাণিত আছে। এই শ্রেণীর নামায আবার দুই প্রকার; সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ও গায়র মুআক্কাদাহ।

নফল সালাত,

নফল তিলাওয়াত, নফল যিকর, নফল দান ইত্যাদির জন্য তাঁরা ছিলেন সদা উদগ্রীব ও ব্যস্ত। অনেকে বলেন, অমুক ব্যক্তি এত নফল ইবাদত করে, কিন্তু ফরয পালন করছে না, কাজেই নফল করে কি হবে? এ ধরণের কথা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। কেউ যদি ইচ্ছাপূর্বক ফরয বাদ দিয়ে শুধু নফল নিয়ে থাকে তাহলে সে অপরাধী। কিন্তু তার অপরাধের জন্য কি আমরা উল্টা আরেকটি অপরাধ করব? এছাড়া কেউ যদি ফরয ও নফল ইবাদত পালনের চেষ্ট করে কিন্তু ফরযের মধ্যে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হয় তাহলে নফল দিয়ে তা আল্লাহ পূরণ করবেন।

সর্বোপরি ফরয ইবাদত পালনের সাথে সাথে সর্বদা নফল ইবাদত পালন করাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের সুন্নাত। এছাড়া আল্লাহর কাছে অধিকতর নৈকট্য, পুরস্কার, মর্যাদা ও সম্মান অর্জনের মাধ্যমই হলো ফরযের পাশাপাশি নফল ইবাদত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

“আমার নৈকট্যের জন্য বান্দা যত কাজ করে তন্মধ্যে সবচেয়ে আমি বেশি ভালবাসি যে কাজ আমি ফরয করেছি। (ফরয পালনই আমার নৈকট্যে অর্জনের জন্য সবচেয়ে প্রিয় কাজ)। এরপর বান্দা যখন সর্বদা নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আমার বেলায়তের পথে অগ্রসর হতে থাকে তখন আমি তাকে ভালবাসি।”((সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিকাক, নং ৬৫০২।))

নফল ইবাদতগুলির মধ্যে নফল সালাত অন্যতম।

এ বিষয়ে সাহাবীগণের আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। এক সাহাবী প্রশ্ন করেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম কী? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً

“তুমি আল্লাহর জন্য বেশি বেশি সাজদা করবে (বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করবে); কারণ তুমি যখনই আল্লাহর জন্য একটি সাজদা কর, তখনই তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তোমার একটি পাপ মোচন করেন।”

রাবীয়া ইবনু কা’ব নামক এক যুবক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আবেদন করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে এক জান্নাতে থাকতে চান বা জান্নাতে তাঁর সাহচর্য চান। তিনি বলেন:

فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

“তাহলে বেশি বেশি সাজদা করে (নফল সালাত আদায় করে) তুমি আমাকে তোমার বিষয়ে সাহায্য কর।”

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কেয়ামতের দিন বান্দার কাছ থেকে সবার আগে যে আমলের হিসাব নেওয়া হবে, তা হল নামাজ। নামাজ ঠিক হলে সে পরিত্রাণ ও সফলতা লাভ করবে। নইলে (নামাজ ঠিক না হলে) ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সুতরাং (হিসাবের সময়) ফরজ নামাজে কোনও কমতি দেখা গেলে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের বলবেন, ‘দেখ, আমার বান্দার কোনও নফল (নামাজ) আছে কি না।’ অতএব তার নফল নামাজ দ্বারা ফরজ নামাজের ঘাটতি পূরণ করা হবে। তারপর অন্য আমলের হিসাব গ্রহণ করা হবে।’ *-(সুনানে আবু দাউদ, ৭৭০, তিরমিজি, ৩৩৭, ইবনে মাজাহ, ১১৭)*



প্রতিদিন ফরজের আগে ও পরের সুন্নতগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় আদায় করতেন, কখনও কোনও বিশেষ কারণ ছাড়া তা আদায় করা থেকে বিরত থাকতেন না এবং সাহাবায়ে কেরামকে আদায়ের নির্দেশ দিতেন।

সুন্নতের ফজিলত

উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে ও দিনে ১২ রাকাত নামাজ আদায় করলো, জান্নাতে

তার জন্য একটি ঘড় নির্মাণ করা হলো। সেগুলো হলো জোহরের (ফরজ নামাজের) পূর্বে চার রাকাত, পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, ইশার পর দুই রাকাত, ফজর নামাজের পূর্বে দুই রাকাত। *-(তিরমিজি, কিতাবুস সালাত, ১/ ৪৪০,৪৪৫)*

আম্মাজান হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিয়মনিষ্ঠভাবে দিন-রাতে ১২ রাকাত নামাজ পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; জোহরের (ফরজ নামাজের) আগে চার রোাত ও পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, এশার পর দুই রাকাত এবং ফজরের (ফরজের) আগে দুই রাকাত।'*-(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৫৭৭)*



নামাজের আগে=পরে সুন্নত দুই প্রকার

যেসব সুন্নত ফরজ নামাজের আগে-পরে পড়া হয় তা হল দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হল, সুন্নতে মুয়াক্কাদা। দ্বিতীয় হল, সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা।

সুন্নাতে মুআক্কাদাহ বা রাতেবাহ্

সুন্নাতে মুআক্কাদাহ সেই সুন্নত নামায, যা মহানবী (ﷺ) ফরয নামাযের আগে-পিছে নিজে পড়েছেন এবং উম্মতকে পড়তে তাকীদ, উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছেন।

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "যে কোন মুসলিম বান্দা প্রত্যহ্ আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে বারো রাকআত নফল (ফরয ব্যতীত সুন্নত) নামায পড়লেই আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার জন্য এক গৃহ্ নির্মাণ করেন। অথবা তার জন্য জান্নাতে এক ঘর নির্মাণ করা হয়।" *(মুসলিম, সহীহ ৭২৮নং, আবূদাঊদ, সুনান, নাসাঈ, সুনান, তিরমিযী, সুনান)*

তিরমিযীর বর্ণনায় কিছু শব্দ অধিক রয়েছে, "(ঐ বারো রাকআত নামায;) যোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরেবের পরে দুই রাকআত, এশার পরে দুই রাকআত, আর ফজরের (ফরয নামাযের) পূর্বে দুই রাকআত।"

হযরত আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিয়মনিষ্ঠভাবে দিবারাত্রে বারো রাকআত নামায পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; যোহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরেবের পর দুই রাকআত, এশার পর দুই রাকআত এবং ফজরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাকআত।" (নাসাঈ, সুনান, এবং শব্দগুলি তাঁরই, তিরমিযী, সুনান, ইবনে মাজাহ্, সুনান, সহিহ তারগিব ৫৭৭নং)

সুন্নতে মুয়াক্কাদা বলা হয় ওই সুন্নতকে, যার ওপর রাসুলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত এমনভাবে আমল করতেন যে তা ওজরবিহীন (বিশেষ অপারগতা) কখনও ছাড়তেন না। যেমন, পুরুষরা জামাতে নামাজ পড়া, জামাতের জন্য আজান দেওয়া, জোহরের (ফরজ নামাজের)

আগে চার রোাত ও পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, এশার পর দুই রাকাত এবং ফজরের (ফরজের) আগে দুই রাকাত ইত্যাদি।

এই ইবাদতের বিধান হলো—ওজরবিহীন নিয়মিত ছেড়ে দেওয়া গুনাহ, তবে প্রয়োজনে হঠাত্ ছাড়তে পারে। মাঝে মাঝে অপ্রয়োজনে ওজরবিহীন ত্যাগকারীকে তিরস্কার করা হবে, তবে ফাসিক বা কাফির বলা যাবে না।

সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা বলা হয় ওই সুন্নতকে যার ওপর রাসুলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত আমল করলেও ওজরবিহীন মাঝে-মাঝে ছেড়ে দিতেন। তাকে মুস্তাহাব, নফল, মানদুবও বলা হয়।

এর বিধান হলো—এগুলোর ওপর আমল করা প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ। তবে অপ্রয়োজনে ওজরবিহীন ত্যাগকারীকে তিরস্কার করা যাবে না। যথা তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য নফল নামাজ, নফল রোজা, নফল সদকা ও নফল হজ, পরোপকার করা ও জনসেবামূলক কাজ করা ইত্যাদি। তবে এ ধরনের আমলগুলোর মধ্যে কোনো কোনো আমল অন্য আমলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। কোনো কোনো ওলামায়ে কেরামের মতে, মুস্তাহাব-নফলের চেয়ে সুন্নতে জায়েদা তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কেউ যদি তা পড়ে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ পড়ে তাহলেও কোন ক্ষতি হয় না। তবুও ফজরের সময় উত্তম হল তাহিয়্যাতুল মাসজিদ না পড়ে কেবল ফজরের সুন্নত পড়া। কারণ, মহানবী (ﷺ) ফজরের সুন্নতই বড় সংক্ষেপে পড়তেন। (ফাতাওয়া তাতাআল্লাকু বিজামাআতিল মাসজিদ ১৭-১৮পৃ:) তাছাড়া তিনি বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে

উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে যেন পৌঁছে দেয় যে, ফজরের (আযানের) পর দু' রাকআত (সুন্নত) ছাড়া আর কোন (নফল) নামায পড়ো না।" (আহমাদ, মুসনাদ, আবূদাঊদ, সুনান ১২৭৮ নং) "ফজরের পর দুই রাকআত ছাড়া আর কোন নামায নেই।" (তিরমিযী, সুনান, ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ৪৭৮, জামে ৭৫১১নং)

তবে মসজিদে গিয়ে পড়লে জামাআতের সময় খেয়াল রেখে এক সালাম বা ২ সালামের নিয়ত করতে হয়। যাতে সময় সংকীর্ণ হলে এবং ৩ রাকআত পূর্ণ না হতে হতে ইকামত না হয়ে বসে। নচেৎ, সুন্নত ত্যাগ করে জামাআতে শামিল হতে হলে সবটুকুই বরবাদ যাবে। পক্ষান্তরে ২ রাকআত করে পড়লে নষ্ট হওয়ার ভয় থাকবে না।

এই সুন্নতের কাযা :

সুন্নত কাযা পড়া সুন্নত; জরুরী নয়। কারণবশত: যোহরের পূর্বের সুন্নত পড়তে না পারলে ফরযের (পরের সুন্নতের) পরে তা কাযা করা বিধেয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'নবী (ﷺ) যোহরের পূর্বের ৪ রাকআত পড়তে না পারলে (ফরযের) পরে তা পড়ে নিতেন।' (তিরমিযী, সুনান, তামামুল মিন্নাহ্, আলবানী ২৪১পৃ:)

তদনুরুপ যোহরের পরের সুন্নত পড়তে সময় না পেয়ে যোহরের ওয়াক্ত অতিবাহিত হলেও আসরের পর (নিষিদ্ধ সময় হলেও) তা কাযা পড়া যায়। উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) বলেন, 'একদা আল্লাহর রসূল (ﷺ) যোহরের (ফরয) নামায পড়লেন। ইতি অবসরে কিছু (সাদকার) মাল এসে উপস্থিত হল। তিনি তা ব ন্ট ন করতে বসলেন। এরপর আসরের

আযান হয়ে গেল। তিনি আসরের নামায পড়লেন। তারপর আমার ঘরে ফিরে এলেন। সেদিন ছিল আমার (ঘরে তাঁর থাকার পালি)। তিনি এসে ২ রাকআত হাল্কা করে নামায পড়লেন। আমরা বললাম, 'এ ২ রাকআত কোন্ নামায হে আল্লাহর রসূল? আপনি কি তা পড়তে আদিষ্ট হয়েছেন?' তিনি বললেন, ''না, আসলে এটা হল সেই ২ রাকআত নামায, যা আমি যোহরের পর পড়ে থাকি। কিন্তু আজ এই মাল এসে গেলে তা বন্টন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে আসরের আযান হয়ে যায়। ফলে ঐ নামায আমার বাদ পড়ে যায়। আর তা ছেড়ে দিতেও আমি অপছন্দ করলাম।'' (আহমাদ, মুসনাদ, বুখারী, মুসলিম, আবূদাঊদ, সুনান)

আর এ কথা বিদিত যে, মহানবী (ﷺ) যে আমল একবার করতেন, তা নিয়মিত করে যেতেন এবং বর্জন করতে পছন্দ করতেন না। যার জন্য মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল (ﷺ) আসরের পর আমার কাছে ২ রাকআত (তাঁর ইন্তিকাল অবধি) কখনো ত্যাগ করেননি।' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১৭৮নং)

উল্লেখ্য যে, ঐ ২ রাকআত নামায মহানবী (ﷺ)-এর অনুকরণে আমরাও পড়তে পারি। অবশ্য আসরের পর নিষিদ্ধ সময় হলেও সূর্য হ্লুদবর্ণ হলে তবেই সে সময় নামায নিষিদ্ধ। (আবূদাঊদ, সুনান ১২৭৪নং) তার আগে নয়।

মাগরেবের সুন্নত

পূর্বের কয়েকটি হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যে, মাগরেবের পর ২ রাকআত সুন্নত মহানবী (ﷺ) ত্যাগ করতেন না। তবে এই সুন্নত তিনি ঘরে পড়তেন। একদা মাগরেবের পর তিনি বললেন, “এই ২ রাকআত তোমরা নিজ নিজ ঘরে গিয়ে পড়।” *(আহমাদ, মুসনাদ, আবূদাঊদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান, নাসাঈ, সুনান, মিশকাত ১১৮২নং)*

মাগরেবের সুন্নতেও ফজরের সুন্নতের মতই প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়া সুন্নত। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, ‘আমি গুনতে পারি না যে, নবী (ﷺ) মাগরেবের পর ও ফজরের পূর্বের সুন্নতে কতবার সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পাঠ করেছেন।’ *(তিরমিযী, সুনান ৪৩১, ইবনে মাজাহ্‌, সুনান ১১৬১নং)*

এশার সুন্নত

পূর্বের একাধিক হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যে, এশার পরে মহানবী (ﷺ) ২ রাকআত সুন্নত নিজের ঘরে পড়তেন। পক্ষান্তরে এশার নামায পর বাড়ি ফিরে তাঁর ৪ অথবা ৬ রাকআত নামায পড়ার হাদীস সহীহ নয়।

প্রকাশ থাকে যে, সুন্নত নামায ঘরে পড়ার সুযোগ না থাকলে অথবা সংসারের ব্যস্ততায় পড়ার অবসর না হলে তা মসজিদেই পড়ে নেওয়া যায়।

সুন্নাতে গায়র মুআক্কাদাহ

কিছু সুন্নত আছে যা পড়া মুস্তাহাব, কিন্তু তাকীদপ্রাপ্ত নয়। এমন কিছু সুন্নত নামায নিম্নরুপ:-

আসরের পূর্বে ২ অথবা ৪ রাকআত :

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি কৃপা করেন যে আসরের পূর্বে ৪ রাকআত নামায পড়ে।" (আহমাদ, মুসনাদ, আবূদাঊদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান, ইবনে খুযাইমাহ্, সহীহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ, সহিহ তারগিব ৫৮৪নং)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'নবী (ﷺ) আসরের পূর্বে ৪ রাকআত নামায পড়তেন এবং প্রত্যেক দুই রাকআতে আল্লাহর নিকটবর্তী ফিরিশ্তা, আম্বিয়া ও তাঁদের অনুসারী মুমিন-মুসলিমদের প্রতি সালাম (তাশাহহুদ) দিয়ে তা পৃথক করতেন। আর সর্বশেষে সালাম ফিরতেন।' (আহমাদ, মুসনাদ, তিরমিযী, সুনান, নাসাঈ, সুনান, ইবনে মাজাহ্, সুনান, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ২৩৭নং)

লক্ষণীয় যে, আসরের (দিনের) ৪ রাকআত বিশিষ্ট সুন্নত নামায এক সালামেও পড়া বৈধ।

এ ছাড়া মহানবী (ﷺ) বলেন, "প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝে নামায আছে। (যে পড়তে চায় তার জন্য।) (বুখারী, মুসলিম, সুনানু আরবাআহ (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্), জামে ২৮৫০নং) আর সে নামায কমপক্ষে ২ রাকআত। যেমন মহানবী (ﷺ) বলেন, "এমন কোন ফরয নামায নেই, যার পূর্বে ২ রাকআত নামায নেই।" (ইবনে

হিব্বান, সহীহ, ত্বাবারানীরানী, মু’জাম, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ২৩২, জামে ৫৭৩০নং) অবশ্য হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক ২ রাকআতের বর্ণনাও আবূ দাঊদে এসেছে। কিন্তু তা সহীহ নয়। (যইফ আবূদাঊদ, সুনান ২৩৫নং, তামামুল মিন্নাহ্, আলবানী ২৪১পৃ:)

সম্পর্কিত



সাধারণভাবে নফল সালাত

ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিশেষ সালাতের বিশেষ মর্যাদা বা ফযীলতের কথাও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে অন্যতম হলো রাতে তাহাজ্জুদ বা কিয়ামুল্লাইল এবং সূর্যোদয়ের পরে দ্বিপ্রহরের আগে যোহা বা চাশতের নামায। ইসলামের অন্যতম নফল ইবাদত কিয়ামুল্লাইল। প্রথম রাতে বা শেষ রাতে, ঘুমানোর আগে বা ঘুম থেকে উঠে অন্তত কিছু নফল সালাত আদায় করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

একটু ঘুমিয়ে উঠে ‘তাহাজ্জুদ’-রূপে আদায় করলে তার দসাওয়াব ও মর্যাদা বেশি। কুরআনে বারংবার কিয়ামুল্লাইল ও তাহাজ্জুদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অগণিত হাদীসে এ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি যে, রাতের একাকী মুহূর্তে কিছু সময় সালাত, আল্লাহর যিকর, তার সাথে মুনাজাত এবং তাঁরই (আল্লাহর) ইবাদতে ব্যয় করা মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আয়েশা (রা) বলেন:

لا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ لا يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا

"কখনো রাতের কিয়াম (তাহাজ্জুদ) ত্যাগ করবে না; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো তাহাজ্জুদ ত্যাগ করতেন না। যদি অসুস্থ থাকতেন অথবা ক্লান্তি বোধ করতেন তবে তিনি বসে তা আদায় করতেন।"

চাশতের বা সালাতুযযোহার

বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (وفي رواية: سُبْحَةَ الضُّحَى) كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ... تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

"যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা'আতে আদায় করে বসে বসে আল্লাহর যিকির করবে সূর্যোদয় পর্যন্ত, এরপর দু রাক'আত যোহা বা চাশতের নামায আদায় করবে, সে একটি হজ্ব ও একটি ওমরার সাওয়াব অর্জন করবে: পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ (হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব অর্জন করবে।)

এছাড়া ওযুর পরেই দু রাকআত তাহিয়্যাতুল ওযূ, মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে অন্তত দু রাক'আত দুখুলুল মাসজিদ বা তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সালাত নিয়মিত আদায় করার বিশেষ নির্দেশ ও ফযীলত বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক প্রদান করুন। আমীন।

[ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাহিমাহুল্লাহ,
বই: খুতবাতুল ইসলাম,]

সালাতের ফযীলত সমূহ (فضائل الصلاة)

(১) আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ‘ ِ

নিশ্চয়ই ছালাত মুমিনকে নির্লজ্জ ও অপছন্দনীয় কাজ সমূহ হতে বিরত রাখে’ (আনকাবূত ২৯/৪৫)।

আবুল ‘আলিয়াহ বলেন, তিনটি বস্তু না থাকলে তাকে সালাত বলা যায় না।

(১) ইখলাছ (الإخلاص) বা একনিষ্ঠতা, যা তাকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয়

(২) আল্লাহভীতি (الخشية), যা তাকে অন্যায় থেকে বিরত রাখে

(৩) কুরআন পাঠ (ذكر القرآن),

যা তাকে ভাল-মন্দের নির্দেশনা দেয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ‘একদা জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল যে, অমুক ব্যক্তি রাতে (তাহাজ্জুদের) সালাত পড়ে। অতঃপর সকালে চুরি করে। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেন, তার রাত্রি জাগরণ সত্বর তাকে ঐ কাজ থেকে বিরত রাখবে, যা তুমি বলছ (ُإِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُوْل)’।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম‘আ হ’তে পরবর্তী জুম‘আ এবং এক রামাযান হ’তে পরবর্তী রামাযানের মধ্যকার যাবতীয় (ছগীরা) গুনাহের কাফফারা স্বরূপ, যদি সে কবীরা গোনাহসমূহ হ’তে বিরত থাকে (যা তওবা ব্যতীত মাফ হয় না)’।

(৩) তিনি বলেন, তোমাদের কারু ঘরের সম্মুখ দিয়ে প্রবাহিত নদীতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করলে তোমাদের দেহে কোন ময়লা বাকী থাকে কি?... পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের তুলনা ঠিক অনুরূপ। আল্লাহ এর দ্বারা গোনাহ সমূহ বিদূরিত করেন।

(৪) তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি ছালাতের হেফাযত করল, ছালাত তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন নূর, দলীল ও নাজাতের কারণ হবে....।

(৫) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'বান্দা যখন ছালাতে দন্ডায়মান হয়, তখন তার সমস্ত গুনাহ হাযির করা হয়। অতঃপর তা তার মাথায় ও দুই স্কন্ধে রেখে দেওয়া হয়। এরপর সে ব্যক্তি যখন রুকূ বা সিজদায় গমন করে, তখন গুনাহ সমূহ ঝরে পড়ে'।

(৬) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

(ক) যে ব্যক্তি ফজর ও আছরের ছালাত নিয়মিত আদায় করে, সে জাহান্নামে যাবে না'। 'সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।

(খ) দিবস ও রাত্রির ফেরেশতারা ফজর ও আছরের ছালাতের সময় একত্রিত হয়। রাতের ফেরেশতারা আসমানে উঠে গেলে আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় রেখে এলে? যদিও তিনি সবকিছু অবগত। তখন ফেরেশতারা বলে যে, আমরা তাদেরকে পেয়েছিলাম (আছরের) সালাত অবস্থায় এবং ছেড়ে এসেছি (ফজরের) সালাত অবস্থায়'। কুরআনে ফজরের ছালাতকে 'মাশহূদ' বলা হয়েছে(ইসরা ১৭/৭৮)। অর্থাৎ ঐ সময় ফেরেশতা বদলের কারণে রাতের ও দিনের ফেরেশতারা একত্রিত হয়ে সাক্ষী হয়ে যায়।

গ) যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করল, সে আল্লাহর যিম্মায় রইল। যদি কেউ সেই যিম্মা থেকে কাউকে ছাড়িয়ে নিতে চায়, তাকে উপুড় অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(৭) তিনি বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যেগুলিকে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপরে ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি এগুলির জন্য সুন্দরভাবে ওযূ করবে, ওয়াক্ত মোতাবেক ছালাত আদায় করবে, রুকূ ও খুশূ'-খুযূ' পূর্ণ করবে, তাকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর অঙ্গীকার রয়েছে।

(৮) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহর নিকটে প্রিয়তর স্থান হ’ল মসজিদ এবং নিকৃষ্টতর স্থান হ’ল বাজার’।

(৯) ‘যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় (পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে) মসজিদে যাতায়াত করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারী প্রস্ত্তত রাখেন’।

(১০) তিনি বলেন, সবচেয়ে বেশী নেকী পান ঐ ব্যক্তি যিনি সবচেয়ে দূর থেকে মসজিদে আসেন এবং ঐ ব্যক্তি বেশী পুরস্কৃত হন, যিনি আগে এসে অপেক্ষায় থাকেন। অতঃপর ইমামের সাথে ছালাত আদায় করেন।[48] তিনি বলেন, ‘প্রথম কাতার হ’ল ফেরেশতাদের কাতারের ন্যায়। যদি তোমরা জানতে এর ফযীলত কত বেশী, তাহ’লে তোমরা এখানে আসার জন্য অতি ব্যস্ত হয়ে উঠতে’।

(১১) ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়াতলে যে সাত শ্রেণীর লোক আশ্রয় পাবে, তাদের এক শ্রেণী হ’ল ঐ সকল ব্যক্তি যাদের অন্তর মসজিদের সাথে লটকানো থাকে। যখনই বের হয়, পুনরায় ফিরে আসে।

(১২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অন্যত্র সালাত আদায়ের চেয়ে আমার এই মসজিদে ছালাত আদায় করা এক হাযার গুণ উত্তম এবং মাসজিদুল হারামে সালাত আদায় করা এক লক্ষ গুণ উত্তম।

জামা‘আতে সালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত :

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ঘরে অথবা বাজারে একাকী সালাতের চেয়ে মসজিদে জামা‘আতে সালাত আদায়ে ২৫ বা ২৭ গুণ ছওয়াব বেশী।’ তিনি বলেন, দুই জনের সালাত একাকীর চাইতে উত্তম। ...এভাবে জামা‘আত যত বড় হয়, নেকী তত বেশী হয় (ِوما كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ)।

(২) তিনি বলেন, ‘যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, আমার মন চায় আযান হওয়ার পরেও যারা জামা‘আতে আসে না, ইমামতির দায়িত্ব কাউকে দিয়ে আমি নিজে গিয়ে তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে আসি’।

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

(ক) আল্লাহ ও ফিরিশতাগণ ১ম কাতারের লোকদের উপর বিশেষ রহমত নাযিল করে থাকেন। কথাটি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তিনবার বলেন। অতঃপর বলেন, ২য় কাতারের উপরেও। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সামনের কাতার সমূহের উপরে (ِعَلَى الصُّفُوْفِ الْمُقَدَّمَةِ)।

(খ) তিনি বলেন, যদি লোকেরা জানত যে, আযান, প্রথম কাতার ও আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায়ে কি নেকী রয়েছে, তাহ’লে তারা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করত। অনুরূপভাবে যদি তারা জানত এশা ও ফজরের ছালাতে কি নেকী রয়েছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হ’লেও ঐ দুই ছালাতে আসত’।

(গ) তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এশার সালাত জামা‘আতে পড়ল, সে যেন অর্ধরাত্রি সালাতে কাটাল এবং যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা‘আতে পড়ল, সে যেন সমস্ত রাত্রি ছালাতে অতিবাহিত করল’।

(ঘ) তিনি বলেন, মুনাফিকদের উপরে ফজর ও এশার চাইতে কঠিন কোন সালাত নেই।

(৬) তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ৪০ দিন তাকবীরে ঊলা সহ জামা'আতে সালাত আদায় করল, তার জন্য দু'টি মুক্তি লেখা হয়। একটি হ'ল জাহান্নাম হ'তে মুক্তি। অপরটি হ'ল নিফাক্ব হ'তে মুক্তি। ইবনু হাজার বলেন, 'তাকবীরে ঊলা' (التكبيرة الأولى) পাওয়া সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। সালাফে ছালেহীন ইমামের সাথে প্রথম তাকবীর না পেলে ৩ দিন দুঃখ প্রকাশ করতেন। আর জামা'আত ছুটে গেলে ৭ দিন দুঃখ প্রকাশ করতেন'।

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন গ্রাম বা বস্তিতে যদি তিন জন মুসলমানও থাকে, যদি তারা জামা'আতে সালাত আদায় না করে, তাহ'লে তাদের উপর শয়তান বিজয়ী হবে। আর বিচ্ছিন্ন বকরীকেই নেকড়ে ধরে খেয়ে ফেলে'।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: শপথ ঐ সত্তার যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, আমি ইচ্ছা পোষণ করছি যে, কাঠ (জ্বালানী) একত্রিত করার আদেশ দিব এবং এক ব্যক্তিকে আদেশ দিব সে যেন সালাতের ইমামতী করে অতঃপর (যে মসজিদে আসে নি) আমি ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের নিকট গিয়ে তাদের বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দেই।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

(৫) 'যখন কোন মুছল্লী সুন্দরভাবে ওযূ করে ও স্রেফ সালাতের উদ্দেশ্যে ঘর হ'তে বের হয়, তখন তার প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহর নিকটে একটি করে নেকী হয় ও একটি করে মর্যাদার স্তর উন্নীত হয় ও একটি করে গোনাহ ঝরে পড়ে। যতক্ষণ ঐ ব্যক্তি সালাতরত থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার জন্য দো'আ করতে থাকে ও বলে যে, 'হে আল্লাহ! তুমি তার উপরে শান্তি বর্ষণ কর'। 'তুমি তার উপরে অনুগ্রহ কর'। যতক্ষণ সে কথা না বলে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা আরও বলতে থাকে, 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর' 'তুমি তার তওবা কবুল কর'।

ইবন মাসউদের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে- তিনি বলেন, “নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হিদায়াতের তরীকা শিখিয়ে দিয়েছেন এবং হিদায়াতের তরীকাসমূহের অন্যতম হলো যে মসজিদে আযান দেওয়া হয় সেখানেই সালাত আদায় করা।”

(৬) যখন জামা‘আতের এক্বামত হ’বে, তখন ঐ ফরয সালাত ব্যতীত আর কোন সালাত নেই।অতএব ফজরের জামা‘আতের ইক্বামতের পর সুন্নাত পড়া জায়েয নয়, যা প্রচলিত আছে। বরং জামা‘আত শেষ হওয়ার পরেই সুন্নাত পড়বে।

কুরআনের ভাষ্যকর আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফাতওয়ার মাধ্যমে শেষ করতে চাই যা তিরমিযীতে প্রখ্যাত তাবে‘ঈ মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, ইবন আব্বাসকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে দিনে সাওম রাখে এবং রাত্রিতে ইবাদতে মগ্ন থাকে কিন্তু জুমু‘আ ও জামা‘আতের সালাতে উপস্থিত হয় না, তিনি বলেন, সে জাহান্নামী।”

অতএব, জাহান্নামী হওয়ার ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির কী হবে, যে ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করে আল্লাহ কর্তৃক হারাম জিনিসে মত্ত থাকে? যেমন টিভি, সিরিজ (ভি ডি ও, ডিশ) ইত্যাদি এবং দিনে ফজর ও অন্যান্য সালাত আদায় না করে ঘুমায়?

(৭) যে অবস্থায় জামা‘আত পাওয়া যাবে, সেই অবস্থায় শরীক হবে এবং ইমামের অনুসরণ করবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

‘যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযূ করল। অতঃপর মসজিদে রওয়ানা হ’ল এবং জামা‘আতে যোগদান করল, আল্লাহ তাকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় পুরস্কার দিবেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করেছে ও শুরু থেকে হাযির রয়েছে। তাদের নেকী থেকে তাকে মোটেই কম করা হবে না’।

(৮) জামা‘আতের পরে আসা মুছল্লীগণ এক্বামত দিয়ে পুনরায় জামা‘আত করবেন। একজন হ’লে আরেকজন মুছল্লী (যিনি ইতিপূর্বে সালাত আদায় করেছেন) তার সঙ্গে যোগ দিতে পারেন জামা‘আত করার জন্য এবং এর নেকী অর্জনের জন্য। তবে স্থানীয় মুছল্লীদের নিয়মিতভাবে জামা‘আতের পরে আসা উচিৎ নয়।

(৯) তিনি বলেন, তোমরা সামনের কাতারের দিকে অগ্রসর হও। কেননা যারা সর্বদা পিছনে থাকবে, আল্লাহ তাদেরকে (স্বীয় রহমত থেকে) পিছনে রাখবেন (মুসলিম)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নাম পর্যন্ত পিছিয়ে দিবেন (আবুদাঊদ)।

সালাতের প্রকারভেদ:

সালাত ২ প্রকার

১. রুকু সিজদা বিশিষ্ট সালাত

২.রুকু সেজদা বিহীন সালাত

রুকু সেজদা বিশিষ্ট : ১.ফরজ প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত সলাত।

২.ওয়াজিব যথা বিতির দুই ঈদের সালাত

নফলের কাযা তাওয়াফে র পর ২রাকাত সালাত।

১.২ বাদে সকল সালাতই নফল সালাত

সালাতের নিষিদ্ধ স্থান :

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, সমগ্র পৃথিবীই সিজদার স্থান, কেবল কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত'। সাতটি স্থানে ছালাত নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীছটি যঈফ।

সালাতের নিষিদ্ধ সময় ;

তিন সময় সালাত পড়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি সময় সালাত পরা এবং মৃতের দাফন করাতে নিষেধ করতেন। সূয উদয়ের সময় যতখন না তা পুরোপুরি উঁচু হয়েযায়। সূর্য মধ্যে আকাশে অবস্থানের সময় থেকে তা পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পযন্ত যখন সূর্য আস্ত যায়।

সালাত তরককারি/পরিত্যাগের বিধান :

কালেমার সাক্ষ্য দেওয়ার পর সালাতই ইসলামের অধিকতর গুরুত্ব ও তাগিদপূর্ণ রুকন বা স্তম্ভ এবং ইসলামের সবচেয়ে বড় আনুষ্ঠানিকতা, প্রতীক ও উত্তম ইবাদত। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা সালাতকে ঈমান নামে অভিহিত করেছেন। যেমন তাঁর বাণী:

﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمۡ﴾ [البقرة: ١٤٣]

"আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমান (সালাত)-কে নষ্ট করে দিবেন।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪৩]

বিগত শরী'আতসমূহের মধ্য থেকেও কোনো শরী'আত সালাতবিহীন ছিল না। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي﴾ [ابراهيم: ٤٠]

“হে আমার রব! আমাকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও।” [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪০]

এবং ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿ وَأَوۡصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيّٗا﴾ [مريم: ٣١]

“এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৩১]

এবং ইসমাঈল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿وَكَانَ يَأۡمُرُ أَهۡلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِوَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرۡضِيّٗا ٥٥ ﴾ [مريم: ٥٥]

“সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষভাজন।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৫]

যাবতীয় ফরয বিষয় জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মারফত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ফরয হয়েছে, কিন্তু সালাতের জন্য তাঁকে আল্লাহর নিকটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সাথে কথপোকথন করেন এবং তাঁর প্রতি (পঞ্চাশ) ৫০ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেন। অতঃপর তা থেকে কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত বাকী রাখা হয় যার নেকী ৫০ ওয়াক্তেরই সমান। আল্লাহরই সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ।

সালাত ইসলাম এবং কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

»بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة«

“মানুষ এবং শির্ক কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য সালাত ছেড়ে দেওয়া”। (সহীহ মুসলিম)

তিনি আরো বলেন,

»العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر«

“আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে যে পার্থক্য তা হলো সালাত। অতএব, যে সালাত ছেড়ে দিল সে কুফুরী করল।” (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

প্রখ্যাত তাবেঈ শাকীক ইবন আব্দুল্লাহ আল-উকাইলী বলেন, “সাহাবায়ে কিরাম সালাত ব্যতীত অন্য কোনো আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফুরী মনে করতেন না।” (সুনান তিরমিযী)

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।”

উল্লিখিত ও অন্যান্য দলীলসমূহ সালাত পরিত্যাগকারী বড় কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ; যদিও সে পরিত্যাগকারী ব্যক্তি সালাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার না করে। আর এ মত পোষণ করেন ঈমাম আহমদ রহ. এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেন:

«أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة»

“সর্বপ্রথম তোমরা তোমাদের দীনের যা হারাবে তাহলো আমানত এবং সর্বশেষ দীনের যা হারাবে তাহলো সালাত”। (বাইহাকী হাদীসটিকে তার শু‘আবুল ঈমানে বর্ণনা করেন)

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, “সুতরাং ইসলাম থেকে চলে যাওয়া সর্বশেষ বস্তু যখন সালাত তখন যে বস্তুর শেষ চলে যায় সে বস্তু সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এ জন্য আপনাদের দীনের সর্বশেষ অংশ (সালাত)-কে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরুন, আল্লাহ আপনাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।” (ইমাম আহমদের কিতাবুস সালাত)

(ক)(ক) সালাত পরিত্যাগকারীর ইহকালীন বিধান: সালাত আদায়কারী মুসলিম নারীর সাথে বেনামাযীর বিয়ে দেওয়া নাজায়েয। তার অভিভাবকত্ব বিলুপ্ত, তার জবাহকৃত মাংস খাওয়া নাজায়েয, সে তার কোনো আত্মীয়ের সম্পত্তির অংশ পাবে না। তেমনি তার আত্মীয়গণও তার থেকে কোনো অংশের অধিকারী হবে না, মারা গেলে তার জানাযা আদায় করা যাবে না, তার ক্ষমা ও করুণার জন্য দো‘আ করা যাবে না, মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা হবে না এবং সে দীনী ভাই হিসেবে গণ্য হবে না, বরং তার থেকে বিমুখ হওয়া ও তার সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিন্ন করা ওয়াজিব। (শাইখ মুহাম্মাদ ইবন উসাইমীনের “সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান” নামক রিসালা থেকে সংকলিত)

(খ) সালাত পরিত্যাগকারীর পরকালীন বিধান:

(১) বেনামাযীকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে, যেমন সহীহ বুখারীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্বপ্নের বর্ণনায় রয়েছে: “তিনি চিৎ অবস্থায় শায়িত এক ব্যক্তির নিকট আসলেন, এমতাবস্থায় একটি পাথর হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্য একজন, অতঃপর সে উক্ত পাথর দিয়ে তার (শায়িত ব্যক্তির) মাথায় আঘাত করছে, যার ফলে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, পাথরটি ছিটকে দূরে চলে যাচ্ছে, পুনরায় সে দৌড়ে গিয়ে পাথরটি নিয়ে ফিরা মাত্র উক্ত ব্যক্তির মাথা পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় ঐ ব্যক্তি আপন স্থানে ফিরে

তাকে ঐ ভাবেই (শাস্তি) দিচ্ছে যেভাবে প্রথমবার দিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন তখন দুই ফিরিশতা তাঁকে অবহিত করেন যে, এতো ঐ ব্যক্তি যে কুরআন পড়ত, কিন্তু তার প্রতি আমল করত না এবং ফরয সালাত ছেড়ে ঘুমাত।

আমার প্রিয় ভাই! দেখুন কত বড় শাস্তি, শুধু এই জন্য যে বেনামাযী ফরয সালাতকে মাথায় বড় বোঝা মনে করত, তাই মাথায় পাথর মেরে মেরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন।

(২) কিয়ামতের দিন কাফির সরদার কারূন, ফির'আউন, হামান ও উবাই ইবন খালফের সাথে বেনামাযীর হাশর হবে। যেমন, হাদীসে এসেছে:

»من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف«ً

"যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করলো, সালাত তার জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে, আর যে সালাতের হিফাযত করলো না, তার জন্য সালাত কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে না এবং কারূন, ফির'আউন, হামান এবং উবাই ইবন খালফের সাথে তার হাশর হবে।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ইমাম আহমদ রহ. এ হাদীসকে সালাত পরিত্যাগকারীর কুফুরীর ব্যাপারে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা বড় বড় কাফিরদের সাথে বেনামাযীর হাশর হওয়ার জন্য তার কুফুরী সাব্যস্ত হওয়া চাই। ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "এই চার জনকে বিশেষভাবে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা কাফিরদের নেতা।

(৩) বেনামাযী জাহান্নামে যাবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ ٤٣﴾ [المدثر[٤٢، ٤٣ :

"তোমাদেরকে কিসে সাকার (জাহান্নাম)-এ নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।" [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৪২-৪৩]

(৪) বেনামাযী স্বীয় পরিবার এবং ধন-সম্পদ নষ্ট করে দেওয়ার চেয়েও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله«

"যে ব্যক্তির আসর সালাত ছুটে গেল, তার যেন পরিবার ও ধন সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল।" (সহীহ মুসলিম)

অতএব, যে সমস্ত সালাত ছেড়ে দেয় তার কি অবস্থা হবে?

(৫) বেনামাযীকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের এক খালে নিক্ষেপ করা হবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ٥٩﴾ [مريم: ٥٩]

"তাদের পরে আসলো অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা সালাত নষ্ট করল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই "গাইয়া" প্রত্যক্ষ করবে।" [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৯]

আপনি কি জানেন "গাইয়া" কী? গাইয়া হলো, জাহান্নামের একটি নদীর তলদেশ, যার গভীরতা অনেক, যেখানে রয়েছে রক্ত ও পুঁজের নিকৃষ্টতম আস্বাদ। (তাফসীর ইবন কাসীর)

উপসংহার

প্রিয় পাঠক! উল্লিখিত প্রমাণ-পঞ্জি সালাতের গুরুত্ব, ফযীলত এবং ইহকাল ও পরকালে তার উপকারিতা ও ফলাফলের স্পষ্ট দলীল।

এই ফলাফল ও ফযীলত সালাতের পুরোপুরি সংরক্ষণকারী এবং গুরুত্বদানকারীর জন্যই অর্জন হতে পারে, কেননা সালাতের স্থান অতি উচ্চে। ইমাম আহমদ রহ. তার "কিতাবুস সালাতে" বলেন, "তুমি জেনে রাখ! ইসলামে তোমার অংশ আর তোমার নিকট ইসলামের গুরুত্ব ততটুকু যতটুকু সালাতে তোমার অংশ এবং তোমার নিকট সালাতের গুরুত্ব এবং তুমি এমন অবস্থা থেকে বাঁচ যে, তুমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করছ, আর তোমার নিকট ইসলামের কোনো গুরুত্ব নেই, কেননা তোমার অন্তরে ইসলামের ততটুকুই গুরুত্ব হবে যতটুকু তোমার অন্তরে সালাতের গুরুত্ব থাকবে।"

অতএব, প্রিয় দীনি ভাই/বোন যদি আপনি সালাতের ব্যাপারে অথবা সালাত জামা'আতের সাথে আদায়ে বা ফজরের সালাতে অলসতা করে থাকেন তবে হঠাৎ চলে আসা সমস্ত স্বাদ সাঙ্গকারী সকল জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্নকারী মৃত্যু গ্রাস করার পূর্বেই আপনি একান্ত তাওবা করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হোন। নতুবা আপনার জন্য অবশিষ্ট থাকবে শুধু আফসোস আর লজ্জা। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন:

﴿قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ
هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٣ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُۥ مِن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلۡعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ
٥٤ وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحۡسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلۡعَذَابُ بَغۡتَةٗ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ ٥٥
أَن تَقُولَ نَفۡسٞ يَٰحَسۡرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنۢبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّٰخِرِينَ ٥٦ أَوۡ تَقُولَ لَوۡ
أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٥٧ أَوۡ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلۡعَذَابَ لَوۡ أَنَّ لِي كَرَّةٗ فَأَكُونَ مِنَ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٥٨ ﴾ [الزمر[٥٣، ٥٨ :

“বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ- আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পন কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসবার পূর্বে; অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের নিকট থেকে উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার, তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার পূর্বে। যাতে কাউকে বলতে না হয়, হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। অথবা কেউ যেন না বলে, আল্লাহ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকে বলতে না হয়, আহা, যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৩-৫৮]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে সমস্ত গুনাহ-খাতা থেকে তাওবা করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করার ওয়াদা করছেন। কিন্তু তাওবা করার পরে কি করা উচিৎ? আমাদের একান্ত কর্তব্য হলো, আমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করব, তাঁর বিধি-বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করব এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণের মাধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ করব। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে তাওবার ক্ষেত্রে গড়িমসি করা থেকে সাবধান করেন। কেননা মৃত্যু এমন সময় এসে পড়বে যে মানুষ তা বুঝতেও পারবে না, পরে তার জন্য আফসোস ও লজ্জা ব্যতীত আর কিছু থাকবে না।

﴿أَن تَقُولَ نَفۡسٞ يَٰحَسۡرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنۢبِ ٱللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦]

“যাতে কাউকে বলতে না হয়, হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস!” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৬]

সালাতে শিথিলতাকারী বলবে: হায় আফসোস! আমি সালাতে বা সালাতের জামা‘আতে, ফজরের সালাতে বা তা ব্যতীত আল্লাহ এবং রাসূলের অনুসরণে শৈথিল্য করেছি। আর ঐ ব্যক্তি স্বীয় গুনাহ-খাতার জন্য আফসোস করবে।

অতএব, আমাদের সবার কর্তব্য, আল্লাহ তা‘আলার নিকট তাওবা করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ [النور: ٣١]

“হে মুমিনগণ তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১]

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم